**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উপর সেমিনার**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, রবিবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৯, ১০ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

আলোচকবৃন্দ,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

একাত্তরের ৭ই মার্চ। বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। একাত্তরের এদিনেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তিদাতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দেন।

যে জাতি বার বার বিদেশীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে, প্রতারিত হয়েছে সেই জাতি আজ স্বাধীনতার সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা পায়। একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটি রচনা করেন। তিনি মুক্তিপাগল ১০ লাখ মানুষের সামনে তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।''

বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত গণমানুষের কিংবদন্তী নেতা বঙ্গবন্ধুর এ অমোঘ বাণী এক-দুই দিন, মাস বা বছরের প্রস্ত্ততির ফসল নয়। এর প্রতিটি শব্দের বুনন, প্রতিটি বাক্যের বিন্যাস তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৪৭ সাল থেকে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তানের জন্মের শুরু থেকেই।

প্রায় শতভাগ বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তান আর বারোশ মাইল দূরে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ভাষা-ভাষী নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। অমিলের জন্ম সেখান থেকেই।

শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে শুরু করে। আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালিদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

১৯৪৮ সাল থেকেই বাঙালিরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে দেশের ছাত্রদের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়ে। জিন্নাহ, লিয়াকত, নাজিমুদ্দিনদের কাছে বাংলার কোনো স্থানই নেই। অথচ পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঢাকায় ছাত্র-জনতা আন্দোলন-বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। আসে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তারপর থেকে বাঙালি আর রাজপথ ছাড়েনি।

সুধিমন্ডলী,

চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সরকারকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ষড়যন্ত্র করে মাত্র ১ মাস ২৭ দিনের মাথায় বরখাস্ত করে। ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট আবার সরকার গঠন করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র পিছু ছাড়েনি। আটান্নতে আসে আইউবের সামরিক শাসন। জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি আন্দোলন চালিয়ে যায়।

বাঙালির স্বাধিকার, স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি পেশ করেন। বাঙালির এ মুক্তি সনদ বাস্তবায়নে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইউবের পতন হয়। আসে ইয়াহিয়া।

সত্তরে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আর প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিই পায় আওয়ামী লীগ।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভুট্টো ক্ষমতার ভাগ চান। সামরিক বাহিনীও ক্ষমতা হাতছাড়া করতে চায় না। ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেও পয়লা মার্চ তা স্থগিত করে। বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

একাত্তরের পয়লা মার্চ লাখো বাঙালি বাঁশের লাঠি হাতে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গবন্ধু লাখো জনতার সামনে অসহযোগ আন্দোলন ও ধর্মঘটসহ ছয় দিনের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। আর বলেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা হবে। সেখানে তিনি পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

সুধিবৃন্দ,

১৯ মিনিটের এই ভাষণই বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালিকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করে। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। আর এজন্যই এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণটির তুলনা শুধু এটিই। এমন গতিময়, তাৎপর্যময়, সুদুরপ্রসারী ভাষণ ইতোপূর্বে কোনো নেতা দিয়েছেন বলে জানা নেই।

একদিকে চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক, অপরদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখার আহ্বান। আবার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলোর কল্যাণচিন্তা।

অনেক গবেষক এ ভাষণটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক গণতন্ত্রের রূপকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালে জাতির উদ্দেশে গ্যাটিসবার্গে দেয়া ভাষণের মিল খুঁজে পান।

কেউ কেউ ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটেনের জনগণকে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের ঐতিহাসিক বেতার ভাষণটির সাথে মিল খুঁজে পান। কিন্তু এ দুটিই ছিল লিখিত বক্তৃতা।

বঙ্গবন্ধু কোনো লিখিত বক্তৃতা নয়, আত্মোপলব্ধি থেকে তিনি এই জয়গান শুনিয়েছেন। এটি ছিল তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের স্বপ্ন, সাধনা, সংগ্রাম ও ত্যাগের ফসল। এ ভাষণের পর ‘‘নিউজউইক'' বঙ্গবন্ধুকে ‘‘রাজনীতির কবি'' আখ্যা দেয়।

বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, মনোবল যুগিয়েছেন আমার স্নেহময়ী মা, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। যিনি নিভৃতে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। বিশেষ করে জাতির পিতা যখন জেলে থাকতেন সেই দিনগুলোতে।

সুধিমন্ডলী,

একাত্তরের ৭ই মার্চ সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে জড়ো হতে থাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। অনেক নারীও এসেছিলেন সেদিন। সবার হাতে বাঁশের লাঠি। অনেকে এসেছেন তীর-ধনুক নিয়ে। দুপুরের আগেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

ছাত্র-যুবসমাজ ও রাজনীতি সচেতন সাধারণ মানুষের প্রবল প্রত্যাশা বঙ্গবন্ধু আজ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একই ধ্বনি, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। জয় বাংলা।

জাতির পিতা ধীরে-সুস্থে ভাষণ শুরু করেন। কি চমৎকার সূচনাপর্ব। ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের প্রতিটি লাইনই উদ্ধৃতিযোগ্য। বাঙালি জাতির জন্য আজীবন পাথেয়। ভাষণের শুরুতে তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাঙালি জাতির ওপর যে বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন করা হয়েছে তার একটি ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

এক সময় তাঁর হৃদয় কথা বলতে শুরু করে। তখন ‘‘আপনি'' সম্মোধন তুমিতে চলে গেছে। বললেন, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তিনি বলেন, তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে বাঙালি জাতিকে আহবান জানিয়ে বলছেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্ত্তত থাকো। তারপরই বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠে, ‘‘মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। কিন্তু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।''

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধুর এ চিরঞ্জীব ভাষণে তাঁর অসাধারণ মানবিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গরীব জনগোষ্ঠীর যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি রিক্সা, রেল, লঞ্চ, ঘোড়ার গাড়ী চালু রাখার নির্দেশ দেন। একদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে যেতে নিষেধ করেন। অন্যদিকে ২৮ তারিখে গিয়ে বেতন নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। এজন্য দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা রাখার নিদের্শ দেন। এজন্যই বঙ্গবন্ধু মহান নেতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

এ ভাষণে তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার প্রমাণও পাওয়া যায়। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বাঙালি জাতিকে বিশ্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। বাঙালি জাতির ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর অযুহাত পেত। অপরদিকে আন্দোলনের জোয়ারকে স্বাধীনতা ঘোষণার কম কোনোকিছুতেই সন্তুষ্ট করা যাবে না। জাতির পিতা তাই বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই কঠিন সময়ে এত ভারসাম্যপূর্ণ বক্তৃতা দেয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। একেই বলে ভিশনারি লিডার।

তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণার পরই বাঙালি জাতি তাদের প্রত্যাশিত নির্দেশনা পেয়ে যায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যা পরিণত রূপ পায় ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে। বঙ্গবন্ধু  বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। তাই ৭ই মার্চের ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত করে রাখবে। আজকের তরুণ প্রজন্মের প্রেরণাও একই সূত্রে গাঁথা।

বাঙালি হয়েও যারা ১৯৪৭ সাল থেকেই ৯৯ শতাংশ বাঙালির চেতনার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেনি তারা বায়ান্নতে বিরোধিতা করেছে। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ৬ দফা বানচাল করতে চেয়েছে। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। বাঙালিদের হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ করেছে। জাতিকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছে। তারাই চক্রান্ত করে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছে। পঁচাত্তরের পর জিয়াউর রহমান তাদের ত্রাণকর্তা হন। আর ২০০১ সালে খালেদা জিয়া তাদেরকে পতাকা দেয়। জঙ্গী-সন্ত্রাসী হতে মদদ দেয়। যার কুফল ভোগ করছে দেশ, বাঙালি জাতি।

বিএনপি'র নেতৃত্বে জামাত-শিবির যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করতে চায়। বিচার হবেই। মদদদাতাদেরও বিচার হবে। ৯৫ শতাংশ জনগণ যা চায় তা রুখবে সাহস কার।

সুধিমন্ডলী,

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ মুক্তির সংগ্রামের যে ডাক দিয়েছিলেন তা আজও অর্জিত হয়নি। আমরা ছিয়ানব্বইয়ে কিছুদূর এগিয়েছিলাম। বিএনপি-জামাত জোট দেশকে আবারও পিছনে নিয়ে যায়। এবার আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, বৈদেশিক সম্পর্কসহ প্রতিটি খাতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করবো। আসুন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে সবাই মিলে আত্মনিয়োগ করি। জয় আমাদের অনিবার্য।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।